সভ্যতার শহরগুলি কৃষির সাফল্যের জন্য দৈবশক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে। মিশরে সূর্য দেবতা *'রে'*, নীলনদের দেবতা *'ওসিরিস'*, মেসোপটেমিয়ার সূর্যদেবতা *'শামাস'*, বৃষ্টি এবং বন্যার দেবতা *'এনলিল'*, উর্বরতার দেবী *'ইনাননা'* প্রধান হয়ে ওঠেন। শাসকরা নির্মাণ করে বিভিন্ন ধর্ম মন্দির ও সমাধিসৌধ। নগর বিপ্লবের ধর্মীয় ফলাফল হিসাবেই গড়ে ওঠে 'পিরামিড' এবং 'জিগুরাতের' মতো সৌধগুলি।

৬) নব্য উদ্ভাবন ও লৌহযুগের সূচনা: কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত কৃষি উপকরণ তৈরি হতে শুরু করে। তামার আবিষ্কারের পথ ধরে ব্রোঞ্জের উদ্ভাবন ঘটে। তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হয়। নগরের শাসক ও অভিজাতগণ ব্রোঞ্জের দ্রব্যসামগ্রী তৈরিতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পরবর্তীকালে আরও কার্যকর ধাতু হিসাবে লোহার আবিষ্কার সম্ভব হয়। এশিয়া মাইনরে প্রথম লোহা আবিষ্কৃত হয় *হিট্টাইটদের* হাত ধরে। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারে তারা ছিল অগ্রগণ্য। লোহার ব্যবহার সভ্যতার অগ্রগুতির ধারণাটিকেই বদলে দেয়।

তাই 'নগর বিপ্লব' শুধু সাধারণ নগর গড়ে ওঠাই ছিল না, এটি ছিল একটা বিপ্লব। আর বিপ্লব ছিল বলেই মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন, ক্রীট ইত্যাদি অঞ্চলে গড়ে ওঠে নগর।

খ. মেসোপটেমিয় সভ্যতা (আক্কাদীয় রাজবংশ পর্যন্ত)

এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশ যা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরকে ঘিরে অবস্থিত, সেটাই মূলত মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত। ঐ অঞ্চলটিতে মরুভূমি ও শুষ্ক স্তেপ অঞ্চলের আধিক্য অনেক বেশি। এছাড়া আছে কিছু নদী এবং সে কারণে কিছু অতি উর্বর উপত্যকা বিদ্যমান। ঐ অঞ্চলের দুটি বড়ো নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপত্যকা। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তা ইতিহাসে *মেসোপটেমিয় সভ্যতা* নামে পরিচিত। 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ'। আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উদ্ভব হয়। গ্রিক লেখকগণ সর্বপ্রথম 'মেসোপটেমীয়া' শব্দটি ব্যবহার করেন।

ভৌগোলিক অবস্থান: ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে মেসোপটেমিয় অঞ্চলটি ছিল সভ্যতার উন্মেষের জন্য খুবই উপযোগী। ভৌগোলিক আকৃতির জন্য এই অঞ্চলকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি বা *'The Fertile Cresecnt'* বলা হয়। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল পশ্চিম ও দক্ষিনে আরব মরভূমি,

দক্ষিন পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলান পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। উত্তর ও পূর্বদিকে উচ্চ পার্বত্যাঞ্চল মেসোপটেমিয়াকে প্রাকৃতিক প্রাচীরের সুবিধা দিয়েছিল।

A. মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতা উন্মেষের কারণ: মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতা উন্মেষের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিদ্যমান।

১. ভৌগোলিক অবস্থান: টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী প্রতিবছর দু'কূল প্লাবিত করত। ফলে পলি জমে জমে উর্বর হয়ে উঠত ভূখণ্ড। এই অঞ্চলটির উত্তরে আর্মেনীয় পর্বত, পূর্বে উচ্চ মালভূমি, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে আরব মরুভূমির অবস্থান। ফলে অঞ্চলটি সভ্যতা উন্মেষের আদর্শ পীঠস্থান বলা যায়।

২. নব্য প্রস্তর যুগের ভূমিকা: মেসোপটেমিয় সভ্যতা নব্যপ্রস্তর যুগে পদার্পণ সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব আছে। নব্যপ্রস্তর যুগে উত্তর ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতে যে সংস্কৃতি সূচনা হয় তা 'জারমো', 'হালাম্য', 'হিউবেইদ' নামে পরিচিত ছিল। ইউবেইদ সংস্কৃতির মানুষেরা নগর পত্তন করেছিল। ইউবেইদ সংস্কৃতির আরও দক্ষিণে 'ওয়ারকা' নামের অপর এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ইউবেইদ ও ওয়ারকা যুগের সংস্কৃতির বিকাশের সূত্র ধরে মেসোপটেমিয় জনগোষ্ঠী সভ্যতায় দ্রুত পদার্পণ করে।

৩. কৃষিকার্যের ভূমিকা: নব্যপ্রস্তর যুগে এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের সূচনা হয়। মেসোপটেমিয় অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর স্থান এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকার উর্বর পলিমাটি মানুষের বসতি ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করেছিল।

৪. নদ-নদী ও সেচব্যবস্থার ভূমিকা: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা ইউফ্রেটিস নদীর জলের প্রবাহ যে কাজে লাগায় এবং জল সেচের ব্যবস্থা করতে শেখে। মেসোপটেমিয়ায় কৃষি কাজের জন্য এ-ধরনের সেচব্যবস্থার খুবই দরকার ছিল। কারণ ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল কম। ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা অনুধাবন করে যে বৃষ্টির জলের চেয়ে সেচের জল চাষের জন্য বেশি উপযোগী এবং উপকারী। এতে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উন্নত সেচের প্রচলনের ফলে প্রচুর ফসল ফলতে থাকে। ফলে কিছু মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। পরবর্তীকালে এরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসক বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করেই নগরিক প্রতিষ্ঠান এবং নগর কাঠামোর ভিত গড়ে ওঠে।

শুধু সেচব্যবস্থার উন্নতিসাধনই নয়, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নাব্যতা থাকায় এই দুটি নদী ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ছিল। নদী দুটি মেসোপটেমিয়ার নৌবাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যাতায়াতের জন্যও নদী দুটি ব্যবহৃত হত।

৫. ঘন জনবসতি: মেসোপটেমিয়ায় কৃষিকার্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে ঘন জনবসতি গড়ে ওঠে। মানুষ গ্রাম থেকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে।

B. মেসোপটেমীয়ার অন্তর্গত সভ্যতাসমূহ: মেসোপটেমিয় অঞ্চল দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চল মূল মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণাঞ্চল সিনার। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে 'হালাফ' এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'আল-ইউবেইদ' সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে সর্বপ্রথম সুমেরীয় জানগোষ্ঠী সভ্যতার উন্মেষ করে। মেসোপটেমিয়াতে কোনো একক জাতি দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও এই সমগ্র অঞ্চলে কালক্রম অনুযায়ী *সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ক্যাসাইট, আসিরীয়* ও *ক্যালডীয়* সভ্যতাসমূহ একত্রে *মোসোপটেমিয় সভ্যতা* সৃষ্টি করে। এভাবেই ইতিহাসখ্যাত মেসোপটেমিয় নগররাষ্ট্র উর, উরুক, লাগাস, নিপ্পুর, এরিদু, উম্মা প্রভৃতি নগররাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটে। ইউবেইদ সংস্কৃতির মানুষেরা নগর পত্তন করেছিল।

সুমেরীয়দের উত্থান: মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে সর্বপ্রথম সুমেরীয় জনগোষ্ঠী সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। সুমেরীয় জাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বসবাস করে। এরা ছিল অ-সেমেটিক জানগোষ্ঠী এবং মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরীয়রা ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে। সুমেরীয় শাসনের প্রথম পর্ব ইতিহাসে প্রাচীন সুমেরীয় যুগ বা আদি রাজবংশ নামে পরিচিত। এই যুগ অতিবাহিত হয়েছিল যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। প্রতিবেশী নগররাষ্ট্রগুলোর সাথে সুমেরীয়দের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল একের উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তার করা। নগররাষ্ট্র লাগাশ ও উম্মা প্রায় দুই শতক পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ২৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। সেমেটিক গোত্রভুক্ত আক্কাদীয়দের হাতে সুমেরীয়রা পরাস্ত হয়।

অর্থনীতি: সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। এখানে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্যের দরজা খুলে গিয়েছিল। জমিজমা রাজার নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হত না এবং বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর কোনো সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। সুমেরীয় অর্থনীতির মূল উৎস ছিল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য।

কৃষি: সুমেরীয় সমাজে কৃষি ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি। কৃষক হিসাবে সুমেরীয়রা ছিল বেশ উঁচু স্তরের। মেসোপটেমিয়ার জমির উর্বরতা ও জলসম্পদ দেখে খুব উৎসাহ সহকারে সুমেরীয়রা এই অঞ্চলে এসেছিল। বসতি স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা চাষ-আবাদেও মনোযোগী হয়। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটিতে প্রতি বছর বন্যা এসে ঘর-বাড়ি ও চাষ-আবাদের প্রচুর ক্ষতি করত। প্রবল স্রোত নদী দুটিতে নানা জঞ্জাল ও মাটি ফেলে নদীর গভীরতা নষ্ট করত। ফলে সামান্য বন্যা এলেই নদীর দুই কূল উপচিয়ে পড়ত। অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি সেচেরও প্রয়োজন ছিল। সুমেরীয় চাষির প্রধান সমস্যা ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা, বহু খাল কেটে নদীর জল দেশের ভেতরে নানা স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা। ঐ খালগুলো সেচের কাজের উপযোগী হয়েছিল এবং স্থায়ী জলসেচেরও ব্যবস্থা করেছিল তারা। খালের পাড়কে অনেক উঁচু করা হয়েছিল। খালের ভিতর দিয়ে নদীর জল বের করে দেওয়ার ফলে বন্যার প্রকোপ কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে নদীতে বাঁধ ও সেচই ছিল সুমেরীয় কৃষির উন্নতির মূল কারণ। সুমেরীয় কৃষক নানা ফসলের চাষ করত। যব, গম, খেজুর, রাই, বার্লি ইত্যাদি। এছাড়া খেতখামারে খেজুর ও শাক সবজি উৎপাদন করত। মেসোপটেমিয়াতেই সর্বপ্রথম গমের চাষ শুরু হয়। জনপদের চারদিকে ঘিরে থাকত খেজুর গাছের সবুজ বন। খেজুর গাছকে তারা বলত 'প্রাণবৃক্ষ'। খেজুর থেকে তারা তৈরি করত মদ ও মধু। খেজুরের আঁটিকে তারা ব্যবহার করত জ্বালানি হিসাবে। খেজুর গাছের ছাল থেকে তারা তৈরি করত দড়ি ও ঝুড়ি। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার মাটি এত উর্বর ছিল যে, শস্যবীজ বপনের তুলনায় ফসল ফলত অনেক বেশি। একটা খেজুর গাছে বছরে খেজুর ধরত প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। এরকম অতিফলনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ফসল পাওয়া যেত। কাঠের লাঙলের পরিবর্তে ধাতুর ফাল, কাস্তে, নিড়ানি ব্যবহার করত সুমেরীয় কৃষকরা। সেচ ব্যবস্থা দ্বারা নদী থেকে শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল তারা। সুমেরীয়গণ প্লাবন রোধে বাঁধ দিত এবং প্রয়োজনে খালের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করত। যাতে শুখা মরশুমে শস্য উৎপাদন ব্যাহত না হয়। এই ব্যবস্থা *'জলবাহী বাঁধ ব্যবস্থা'* নামে পরিচিত ছিল। ঋতুর সময় সম্বন্ধে ধারণা থাকায় জোয়ারভাটার সময় জলের ওঠানামার উপর তারা তীক্ষ্ণ নজর দিতে পারত। কৃত্রিম হ্রদের জল কৌশলে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে তারা জানত। কৃষি ছিল সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা।

পশুপালন: সুমেরীয়রা তাদের খামারে পালন করত শূকর, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু। তাদের মাংস ভক্ষণ করত। সুমেরীয় কৃষক সর্বপ্রথম টানা লাঙল

ব্যবহার করেছিল তাদের কৃষিকার্যে। পশুদ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা প্রবর্তন করে তারা। বলদ এবং ষাঁড় দিয়ে জমিতে লাঙল দেওয়া হত এবং গাধা ও ঘোড়াকে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত।

কারিগরি শিল্প: সুমেরীয়রা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রুপা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত। সুমেরীয়রা ধাতুবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারা চকমকি পাথর দিয়ে নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরি করার কৌশল জানত। সুমেরীয়রা বস্ত্র বয়নের কৌশল রপ্ত করেছিল। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পশমি কাপড়ের সুখ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁটেল মাটি দিয়ে তারা তৈরি করত গামলা, বাক্স; আর মাটির ইঁট দিয়ে বানাত ঘড়বাড়ি। চাষি ছাড়াও সুমেরীয় সমাজে স্বর্ণকার, লৌহকার, তাঁতি, রঞ্জক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাদারি শ্রেণীর লোকও ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য: মেসোপটেমিয়ার দ্বিতীয় অর্থনৈতিক উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। সুমেরীয় সমাজের রাজকোষের দ্বিতীয় বৃহৎ আয়ের উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে তারা উর ও উরুক ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল। সুমেরীয় ব্যবসায়ীগণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থায় নিয়োজিত ছিল। ব্যবসায়ীগণ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবসাতে নিয়োজিত ছিল না, অন্তর্দেশীয় তথা বহির্বাণিজ্যেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন অর্জন করেছিল। উত্তর ও পশ্চিমের দেশসমূহ থেকে তারা ধাতু ও কাঠ এবং মেসোপটেমিয় উপত্যকার নিম্নাঞ্চল থেকে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করত। নগরের ঘড়বাড়ি তৈরির জন্য তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের প্রয়োজন ছিল। আবার দেবতাদের মন্দির সুসজ্জিত করার জন্য সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ, দস্তা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুরও প্রয়োজন ছিল। এই সব জিনিস তারা সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করত। মেসোপটেমিয়া থেকে শস্য, ভেড়া, ও প্রচুর পশমের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ বিদেশে রপ্তানি করা হত। শহরে বসবাস করত কারিগররা, আড়ম্বরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী তাদের প্রতিবেশী জনগণের থেকে ধাতু, কাঠ ও পাথর সংগ্রহ করত; তার বিনিময়ে তারা তাদেরকে খাদ্যশস্য, খেজুর আর পশম দিত। বণিকরা বিক্রেতা নিয়োগ করে দূর-দূরান্তে কমিশন ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করত। প্যালেস্টাইন, ফিনিশিয়া, ক্রীট, ইজিয়ান দ্বীপাঞ্চল, এশিয়া মাইনর ও মিশরীয় অঞ্চলের সাথে সুমেরীয়দের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এমনকি নদী বা সমুদ্রপথে সুমেরীয়দের ভূমধ্যসাগরীয় এবং ভারতের সিন্ধু নদের তীরবর্তী শহরগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সুমেরীয়গণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। তারা চাকাবিশিষ্ট গাড়ির প্রচলন করে। তারা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবহার জানত যার দ্বারা দূরদূরান্তে পণ্য পরিবহণ সহজ হয়েছিল। তারা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিল, রিসিট, নোট, ঋণপত্রের ব্যবহার প্রচলন করে। ব্যবসার চুক্তিপত্রে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর প্রদান করত এবং দলিলে সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকত। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করত এবং তাদেরকে বিদেশে প্রেরণ করে কমিশনের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়া হত। সুমেরীয়দের কোনো মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না। ব্যবসা লেদেনের জন্য নির্দিষ্ট ওজনের সোনা বা রুপার বাট মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত। মেসোপটেমিয় সমাজে বিনিময় বা barter ব্যবস্থা চালু ছিল।

সামাজিক স্তরবিন্যাস: সুমেরীয় সমাজ নানান স্তরে বিন্যস্ত ছিল। সমাজের বিত্তবান ও বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য খুবই প্রকট ছিল। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে অবস্থান করত পুরোহিত তথা ধর্মযাজক, অভিজাত, বণিক, শিল্পপতি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ। চিকিৎসক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ ছিলেন মধ্যশ্রেণীভুক্ত। আর নিম্নশ্রেণীতে অবস্থান ছিল দাস, ভূমিদাস, ও সাধারণ শ্রমিকদের।

উচ্চবিত্তশ্রেণী: মেসোপটেমিয়ায় নগরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে দামি জিনিসপত্র দিয়ে মন্দিরকে সাজানো হত। মন্দিরের বিরাট চত্বরের মধ্যেই ছিল গোলাঘর, অস্ত্রাগার এবং কারখানা। সুমেরীয়দের এই নগরগুলির প্রায় সমস্ত ধনসম্পদ ও জমিজমার মালিক ছিল এক-একজন নগর দেবতা। আর এই নগর দেবতাদের পূজা অর্চনা করা বা মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করবার ভার ছিল পুরোহিতশ্রেণীর উপর। সেই পুরোহিতশ্রেণীই ক্রমে নগরদেবতার প্রতিনিধি হিসাবে নগরগুলির প্রধান হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কারিগরি শিল্পে সমৃদ্ধ, ধনসম্পদ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ সুমেরীয়ার প্রাচীন নগরগুলোর প্রায় সবকিছুর ষোলোআনা মালিকানা ছিল নগরদেবতাদের। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিশিষ্ট এক পুরোহিতশ্রেণীর উত্থান ঘটে। মেসোপটেমিয়ায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন এবং পুরোহিতগণই সবচেয়ে বেশি জমিজমা ভোগ করতেন, দাসদাসী রাখতেন এবং অর্থের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ রৌপ্য সঞ্চয় করতেন। রাজা প্রধান পুরোহিতের কাজ করতেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে পুরোহিত রাজা শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। নিপ্পুর, এরেক, কিস, উর, উরুকের মন্দিরে পুরোহিত সেবায়েত নিযুক্ত ছিল। ঋতুর সময় নির্ণয় ও খাল খননের কৌশল তাদের জানা ছিল। শুধু পুরোহিত নয়, ভূ-স্বামী অভিজাতবর্গ আরাম আয়াসে

জীবনযাপন করতেন। তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল উচ্চশ্রেণীতে এবং সমাজে তারা অসাধারণ কৃর্তত্বের অধিকারী ছিলেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণী: সাধারণ নাগরিকবৃন্দ ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি ও স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। চিকিৎসক, প্রকৌশলবিদ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। দেবতাদের নানা প্রকার জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য বেশ কিছু কারিগর নিযুক্ত ছিল। রুটি তৈরি করবার জন্য ছিল বেশ কয়েকজন কারিগর। এদের সকলকে বার্লি দিয়ে মজুরি দেওয়া হত। এদের সাহায্য করত মহিলা ক্রীতদাসরা। ক্রীতদাসদের সাহায্য নিয়ে কারিগররা পানীয় তৈরি করত। দেব-দেবীদের যে নিজস্ব ভেড়ার পাল ছিল, সেগুলো থেকে পশম তৈরি করবার কাজে নিযুক্ত ছিল চল্লিশ জন মহিলা কারিগর। সুতো কাটা এবং তাঁত বুনবার জন্য ছিল মহিলা কারিগর। এছাড়া ছিল পুরুষ-কর্মকার এবং অন্যান্য নানা কাজে নিযুক্ত কারিগরদের দল। এই সমস্ত কাজে যা কিছু হাতিয়ারপত্র দরকার হত—অর্থাৎ ধাতব হাতিয়ার, লাঙল, লাঙল টানবার পশু, মাল বহনের গাড়ি, নৌকা প্রভৃতি সবকিছুই মন্দিরগুলিকে মজুত থাকত। এইসব জিনিসগুলি মিশরের সম্পত্তি হিসাবেই বিবেচিত হত।

নিম্নবিত্তশ্রেণী: নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল সমাজের দুঃস্থ শোষিত দাস-দাসীবৃন্দ। যুদ্ধবন্দিদের দাসে পরিণত করা হত এবং কখনও-কখনও ক্রয় করে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। তারা জমির চাষআবাদে নিয়োজিত থাকত। তাদের উপর ঋণের বোঝা থাকত এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে শোচনীয় জীবনযাপন করত। অসংখ্য দাস-দাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারে ও মন্দিরে নিযুক্ত ছিল। মেসোপটেমিয়ার দাসদের বলা হত 'নতচক্ষুর দল', অর্থাৎ মনিবের দিকে চেয়ে থাকার সাহস তারা পেত না। অধিকাংশ চাষি এবং কারিগরই ধনী ব্যক্তিদের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ থাকত। চড়া সুদ সহ ঋণ শোধ করতে হত। ঋণের বোঝা সারাজীবন তাদের টেনে চলতে হত। দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগের মধ্যেই জীবন কাটত সাধারণ চাষি, কারিগর এবং ক্রীতদাসশ্রেণীর লোকজনরা। সাধারণ একটি চাষি কখনই আড়াই একরের বেশি জমি পেত না। ভাগচাষি ও দিনমজুররা জমি থেকে কিছুই পেত না। মন্দিরে যেসব কারিগররা কাজ করত তারা তাদের খাটুনির বিনিময়ে স্বল্পমাত্র বার্লি মজুরি হিসাবে পেত। দেবতাদের বিরাট সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য যেমন একদিকে ছিল কর্মচারী, কেরানি ও পুরোহিতের দল—তেমনি অন্যদিকে নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করবার জন্য ছিল অনেক কারিগর। সুমেরীয় সমাজে ক্রীতদাসীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সুমেরীয় সমাজে দাসরা মুক্ত নারী বিয়ে করতে পারত। সেক্ষেত্রে তাদের সন্তানরা মুক্ত হিসাবে বিবেচিত হত। পিতার মৃত্যুর পর এরা অর্ধেক সম্পত্তি লাভ করত।

কৃষিকাজ, পশুপালন ও হস্তশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে দক্ষিণ মেসোপটেমীয়ায় দাস, স্বাধীন গোষ্ঠী-চাষি এবং ধনী দাস মালিকদের শ্রেণীবিন্যাস গঠিত হতে লাগল। আদি রাজবংশের আমলে একটি সংঘবদ্ধ সমাজকাঠামো গড়ে উঠেছিল। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল। ঐ মন্দির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল কর্মকর্তা, পুরোহিত, কারিগর, বণিক, জেলে, মালি সহ নানান পেশার লোক। দাসরাও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। মন্দিরের সম্পত্তি সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের অধিকারে ছিল। কিন্তু দেবতার প্রতিনিধি রূপে পুরোহিতরা দেবতার সমস্ত সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বলেই মনে করত।

নগরে অবস্থিত মন্দিরটি ছিল সকলের প্রাণকেন্দ্র এবং কর সংগ্রহের মাধ্যমে এই মন্দির গোটা অঞ্চলটিকে একত্র করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষের দিকে একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। যদিও খুবই ছোটো। যেখানে নগরই এর যাবতীয় সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণসমূহ ধরে রেখেছিল।

C. রাষ্ট্রকাঠামো: সুমেরীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল নগররাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন বা কনফেডারেশন। প্রতিটি নগররাষ্ট্র বা City States ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। কেবলমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার সময় এই সমস্ত নগররাষ্ট্র সংঘবদ্ধভাবে সামরিক জোট সৃষ্টি করত। বেশ কয়েকটি শহর বা নগরকে কেন্দ্র করে বৃহৎ অর্থে সুমেরীয়দের রাজনৈতিক কাঠামোর বিকাশ ঘটে। নগরগুলোর মধ্যে উরুক, উর, নিপ্পুর, লাগাস, এরিদু এবং কিশ ছিল অন্যতম। নদী তীরবর্তী সভ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুমেরীয় নগরসমূহেও প্রতিফলিত হয়েছিল। নগরগুলো স্বাধীন ভাবে শাসিত হত। সুমেরীয়র ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধানকে বলা হত 'পাতেশী'। 'পাতেশী' একাধারে তিনটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন—রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান পুরোহিত এবং সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। বিশেষ সময়ে এই প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত এবং ক্রমে তিনি কয়েকটি শহরের প্রধান নিযুক্ত হতেন। এভাবেই সুমেরের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজার অস্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে।

১. মেসোপটেমিয়ায় নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট: একটি নগরের স্বাভাবিক গঠন এবং ভূদৃশ্য নতুন রূপে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে দুটি উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক) প্রাকৃতিক ভূচিত্র, যা সম্পূর্ণভাবে ভূগোল ও পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত এবং খ) 'নির্মিত ভূচিত্র', যা মনুষ্যকৃত উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদ্ভূত। নির্মিত ভূচিত্রের ফলশ্রুতিতে জনবসতির সুযোগসুবিধেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নগর বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে 'প্রাকৃতিক ভূচিত্রই

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিশেষ করে, মেসোপটেমিয় সভ্যতার একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের পাললিক বদ্বীপের অনন্য পরিবেশ এই অঞ্চলে মানবজীবনের স্থায়ী ভৌগোলিক ভিত্তির সন্নিবেশে সহায়ক হয়েছিল। দক্ষিণের নগরগুলো কিছু প্রাকৃতিক সুবিধা পেয়েছিল। ১) বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরিপূরক বিভিন্ন বাস্তু সংস্থানগত উপাদানের উপস্থিতি, ২) নিকটবর্তী অঞ্চলের জীবনধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং ৩) খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্বে হাতের নাগালের কাছে অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য বা আহরণযোগ্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাচুর্য। এ প্রসঙ্গে *I. J.Winter* তাঁর *'Representing Abundance: A visual Dimension of the Agrarian State'* শীর্ষক প্রবন্ধে এবং *Robert K. Englund* তাঁর *'Tets from the Late Uruk Period'* প্রবন্ধে অথবা *Guillermo Algaze* তাঁর *'Anceient Mesopotemia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape'* গ্রন্থে মেসোপটেমিয়ায় নগররাষ্ট্রের বিকাশের পশ্চাতে নানা কারণের অবতারণা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, উরুক অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল পারস্য উপসাগরের শীর্ষ দেশে জলাভূমির সদ্য অভ্যন্তরস্থিত স্থলভাগে। এর চাষ-আবাদ নির্ভর করত ইউফ্রেটিস নদী থেকে প্রাপ্ত সেচের জলের উপর। তাঁরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন: ক) সেচযুক্ত সমভূমিতে প্রচুর দানাশস্য চাষের সুযোগ ছিল, খ) নদীর নিকটে বাগানগুলোতে পাওয়া যেত প্রচুর ফল। বিশেষত খেজুর। গ) কর্ষিত বাগানগুলিতে প্রচুর শাক-সবজি আর বয়নের জন্য শন উৎপাদিত হত। ঘ) দুটি সেচ এলাকার মাঝামাঝি ছিল তৃণাঞ্চল ও বিস্তীর্ণ চারণভূমি। শিকার ছাড়াও সেখানে পশুচারণের সুযোগ ছিল—ভেড়া, ছাগল এবং বিভিন্ন গবাদি পশুর বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্র ছিল। ঙ) নিকটবর্তী জলাভূমিতে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ আর বুনো মোরগ। চ) দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রতিপালন করত মোষ। ছ) উপকূলীয় ও জলীয় পরিবেশে পাওয়া যেত নানা ধরনের নলখাগড়া-জাতীয় গুল্ম। প্রত্যেকটি বাস্তুসংস্থান কর্তৃক খাদ্য জোগানের বিভিন্নতা উৎপাদকদের মধ্যে শ্রমের বিশেষীকরণের জন্ম দিয়েছিল। যেমন—মৎস্যজীবী, কৃষক, বাগানের মালি, শিকারি, পশুপালক ইত্যাদি। বীজ বপন যন্ত্রের উদ্ভাবন কৃষিকাজকে আরও সহজ এবং দক্ষতানির্ভর করে তুলেছিল। এর ফলে সমাজে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একটা বিশেষ সম্পদের উৎপাদনে কিছু মানুষ বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠল। তবে তারা কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ফলে তাদের জীবনধারণের জন্য এক ধরনের বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই বিনিময় সংক্রান্ত পরিষেবার জোগান দিয়েছিল উরুক নগর।

বাণিজ্য, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, শ্রম সগঠন ইত্যাদি উপাদানও মেসোপটেমিয়ার নগর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আবহাওয়া এবং জলাধারগুলোর পরিবর্তনের ফলে তাদের বৃহত্তর জলসেচের জন্য খালের চাহিদা এবং কৃষি ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শস্যদানা চাষের আধুনিক কৃষিসংক্রান্ত উপায়সমূহ এবং প্রাচীন কিউনিফর্ম নথিসমূহ থেকে অনুমিত সিদ্ধান্তগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পালল ভূমিটি বৃষ্টিনির্ভর প্রতিবেশী সমাজগুলোর মতো প্রতি একর জমিতে গড়ে প্রায় দুই বা তিনগুণ উৎপাদনশীল হয়েছিল। প্রত্ন-পরিবেশগত উপাদানসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমগ্র পঞ্চম ও চতুর্থ সহস্রাব্দের কিছু সময় জুড়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস জলবিভাজিকার বেশিরভাগ অংশেই শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখনকার তুলনায় বেশি ছিল।

মেসোপটেমিয়ায় নগররাষ্ট্রের বিকাশে প্রাকৃতিক ভূচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মেসোপটেমিয়ায় সমাজ ব্যবস্থায় সূক্ষ্ম স্তরায়ণের সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ মেসোপটেমিয় ভূচিত্রে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনুপস্থিতি ছিল। সম্ভবত সে কারণেই দক্ষিণের আদি উচ্চবর্গের মানুষের ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে তাদের অধিকারকে বৈধতা দেওয়ার ও সম্প্রসারিত করবার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বাণিজ্যকে ব্যবহার করেছিল। বাড়ির ছাদ তৈরির জন্য ভালো জাতের কাঠ, সাধারণ কাঠ, সাধারণ ও দামি ধাতু, বিভিন্ন ধরনের স্বল্প-দামি পাথর ও খনিজ এবং বৈদেশিক নেশাদ্রব্য যেমন, মদ অপ্রতুল ছিল। নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় স্বল্প-পরিবহণ খরচের সুবিধা তারা পেয়েছিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয় সৃষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে থাকায় নগরগুলির পক্ষে তথ্য, কর্মী ও পণ্যসমূহ সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়েছিল।

২. নগর-রাষ্ট্র সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: সংক্ষেপে সুমেরীয় নগর রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

I. উরুক: মেসোপটেমিয় সভ্যতার, বিশেষ করে সুমেরীয় স্তরের সর্বপ্রাচীন নগরী ছিল উরুক বা বর্তমানের ওয়ারকা। 'উর্বর অর্ধ চন্দ্রিমা' খ্যাত মেসোপটেমিয়ার উরুক থেকে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে এই উরুক যুগের সূচনা হয়। সমৃদ্ধশালী উরুক শহর ছিল একটি সুসংঘবদ্ধ নগর-রাষ্ট্র যা অত্যন্ত শক্তিশালী একদল পুরোহিত গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ছিল। উরুকের অধিবাসীগণ কৃষিজীবী ছিল এবং তারা কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করে। উরুকের জনগণ মৃৎশিল্পের প্রতি মোহগ্রস্ত ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র প্রস্তুত করত। এই সময়ে

সুমেরীয়গণ লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং চিত্রলিখন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাথর ও তামার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তারা ব্যবহার করত। উরুকে শিল্পকলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। মার্বেলের স্থাপত্য, মৃৎপাত্র, ভাস্কর্য, খোদাই কাজ অলংকরণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এই নগরে। তৎকালীন যুগে কারিগরি বিদ্যার প্রচলন ছিল এবং বিভিন্ন কারিগরদের সংস্থা বা গিল্ড ছিল—যেমন, ছুতোর, কামার, মৃৎশিল্পী ইত্যাদি। উরুক তথা বর্তমান ওয়ারকা অঞ্চলে ইয়াননা মন্দির আবিষ্কারের পর ওয়ারকা সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

II. উর: উরুকের দক্ষিণে এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সুমেরীয় শহর উর অবস্থিত। ১৯২২ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ লিওনার্ড উলা খননকার্য পরিচালনা করে প্রাচীন উর নগরীর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে ২০০০ অব্দ পর্যন্ত উর ছিল তৎকালীন বিশ্বের সুসমৃদ্ধ ও সুপরিকল্পিত নগরী। উলা খননকার্য পরিচালনা করে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর থেকে বহু মূল্যবান প্রত্নসম্পদ, হিরা, জহরত, সোনা ও রুপার পাত্র, অলঙ্কার, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, রুপার বীণা, মূল্যবান পাথর ও হাতির দাঁতের আসবাবপত্র, সোনার মস্তক আবরণ উদ্ধার করেন। এই নগরে স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে; যার প্রমাণ জিগুরাত এবং রাজকীয় সমাধিগুলি। বাণিজ্যবন্দর হিসাবেও উর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশেষত পারস্য উপসাগর মারফত উপকূল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

III. নিপ্পুর, লাগাস, এরিদু: নিপ্পুর, লাগাস ও এরিদুঃ নগর গুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। সমগ্র সুমেরীয়ার ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল নিপ্পুর। এই শহরের সর্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল দেবতা *'এন-লিন'*-এর মন্দির। নিপ্পুরের প্রাণকেন্দ্র ছিল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত স্তরবিশিষ্ট পিরামিডের আদলে তৈরি মন্দির জিগুরাত। মন্দিরটি বায়ু দেবতা *এন-লিলের* নামে উৎসর্গ করা হয়। রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, লাগাস ছিল একটি সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ নগরী। ধর্ম মন্দির বা জিগুরাত ছাড়াও বিভিন্ন ইমারত, ভাস্কর্য, শিল্পকলার চর্চা হত লাগাসে। লাগাসের ব্যবসায়ীগণ সমুদ্রযাত্রা করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সাথে লাগাসের বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। লাগাসের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় রাজা গুদিয়ার রাজত্বকালে। গুদিয়ার রাজত্বের সময়ের বিস্তৃত লিখনফলকে, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। আর. ক্যাম্বেল থমাস এরিদুতে খননকার্য পরিচালনা করে নব্যপ্রস্তর ও ব্রোঞ্জ যুগের প্রত্নসামগ্রীর সন্ধান লাভ করেন। এছাড়া, অন্যান্য নগররাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম ছিল উম্মা, লারসা, ইসিন, সিপার প্রমুখ।

৩. **নগর রাষ্ট্রগুলির শাসন পদ্ধতি:** একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সুমেরীয় নগররাষ্ট্র পরিচালিত হত। সুমেরীয়গণ স্বাধীন নগররাষ্ট্রসমূহের একটি সংঘবদ্ধ কনফেডারেশনে বসবাস করত। রাজা ছিলেন মূলত একজন সমর নেতা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক অভিজাতকে নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হত। অন্যদিকে অ্যাসেম্বলির সদস্য হত রাষ্ট্রের সফল পুরুষ নাগরিক। অভিজাতদের কাউন্সিল সাধারণ নাগরিকদের উপর সব ধরনের খবরদারি করতে পারত। উর-এর রাজা ডুঙ্গী খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে সর্বপ্রথম সমস্ত নগররাষ্ট্রগুলিকে একত্রীভূত করে একটি সুসংঘবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও সামরিক ক্ষমতা ও প্রতাপের উপর এগুলোর অস্তিত্ব নির্ভর করত। নগরের প্রধানকে বলা হত 'এনসি' অর্থাৎ গভর্নর। তিনি একাধারে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নগররাষ্ট্রগুলোর শাসনকর্তাকে বলা হত 'লুগাল' অর্থাৎ 'ক্ষমতাবান ব্যক্তি'। রাজাগণ পুরোহিতের কতর্ব্য পালন করতেন। সুমেরীয় রাজবংশের বিস্তৃতি ঘটে উরুক, উর, কিস প্রভৃতি নগররাষ্ট্রে। রাজা সামরিক, প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলাচর্চায় এবং ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতেন। প্রত্যেক নগররাষ্ট্রে এক-একটি অভিজাতশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিয়োজিত থাকতেন। এছাড়া নাগরিক জীবনের সকল সুযোগসুবিধা তারা ভোগ করতেন।

৪. **ধর্ম:** সুমেরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস ছিল খুব জটিল। সুমেরীয় যুগে প্রত্যেক নগররাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল মন্দির। উরুক, উর, কিস, নিপ্পুর, এরিদু, লাগাস প্রভৃতি শহরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মন্দির নির্মিত হয়। সুমেরীয়দের ধর্ম ছিল বহু দেবদেবীনির্ভর। তারা বিশ্বাস করত মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে দেবদেবীর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। প্রকৃতির রুদ্র ভাবমূর্তিতে তারা ভীত শাসিত হয়ে প্রকৃতির প্রতীকরূপী বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। বন্যা ও খরা তাদের জীবনকে দুর্বিশহ করে তোলে। এই কারণে তারা *'এন-লিন'* নামক বৃষ্টি ও বাতাসের দেবতার পূজা করত। সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সার্বজনীনভাবে সমাদৃত ছিলেন 'এন-লিন'। আলো-তাপের উৎস ছিলেন সূর্যদেবতা *'শামাশ'*। এছাড়া ছিলেন, জলের দেবতা *'এনকি'*, প্রেমের এবং উর্বরতার দেবী *'ইনাননা'* বা *ইস্টার*। অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিষাদের দেবী *'ননকারসাগ'*, বন্যা ও প্লাবনের নিয়ন্ত্রক সেচ দেবতা *'নিনাগিরসু'*, কৃষির দেবতা *'আবু'*, চন্দ্র দেবতা *'সিনের'* এবং মহামারীর দেবতা *'নীবাগন'*। দেবদেবীর সন্তুষ্টির জন্য বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ভেড়া, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ছাড়াও নানা

প্রকার ফল-মূল যেমন—ডুমুর, খেজুর, শশা, এমনকি তেল ও মাখনও উৎসর্গ করা হত। সুমেরীয়দের প্রধান ধর্মমন্দির ছিল 'জিগুরাত'। যার অর্থ হল 'স্বর্গের পাহাড়'। উঁচু ও কৃত্রিম পাহাড়ের ওপর মন্দিরগুলি অবস্থিত ছিল। মন্দির ছিল প্রধান পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণে এবং মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত থাকত পুরোহিতবর্গ, সেবিকা, নর্তকী এবং দাসদাসীবৃন্দ। জিগুরাত থেকে পুরোহিত রাজা 'পাতেসী' ধর্ম পরিচালনা করতেন। সুমেরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ ভালো ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সূর্যদেব মানুষের প্রয়োজনে উষ্ণতা ও আলো দেয়, আবার মাটি উত্তপ্ত করতে এবং ফলবতী হওয়ার পূর্বে শস্যচারা ধ্বংস করতে জ্বলন্ত রশ্মি পাঠায়। মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করেই সুমেরীয়রা বসতি স্থাপন করে। মন্দির ছিল রাজকীয় দপ্তরখানা। প্রতিটি মন্দিরে একটি করে শস্যভাণ্ডার থাকত। মানুষের দানসামগ্রী মন্দিরে জমা রাখা হত। প্রয়োজনের সময় রাজা ও সাধারণ মানুষ মন্দিরের শস্যভাণ্ডার থেকে শস্য ঋণ হিসাবে নিতেন। মৃত্যুপরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুমেরীয়দের তেমন ধারণা ছিল না। স্বর্গ-নরকের ধারণাও জন্ম লাভ করেনি। সম্ভবত এই কারণে সুমের অঞ্চলে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোনোপ্রকার অট্টালিকা, সমাধি বা মমির প্রবণতা দেখা যায় না। তারা মৃতদেহকে কবর দিত।

৫. **সংস্কৃতি:** সুমেরীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় যেমন—সুমেরীয় সাহিত্য, লিখন কৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্পকলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

সাহিত্য: সুমেরীয় সাহিত্য ছিল পুরাকাহিনিনির্ভর। এই কাহিনিগুলো প্রাচীন রাজাদের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। সুমেরীয়রাই প্রথম মহাকাব্য রচনা করেছিল। সুমেরীয়রা 'গিলগামেশ' নামক বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেছিল। 'গিলাগামেশ' মহাকাব্য গড়ে উঠেছিল কিংবদন্তী উচ্চাভিলাষী রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করে। উরুকের বিখ্যাত রাজা গিলগামেশের বীরত্ব গাথা, প্রেম, বন্ধুত্ব, ব্যর্থতা—এ সবেরই বিবরণ আছে ঐ মহাকাব্যে। সৃষ্টিকর্তা ও মহাপ্লাবন সংক্রান্ত সুমেরীয় পুরাণও অন্যতম প্রাচীন একটি ধর্ম সাহিত্য।

লিখনকৌশল: সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম কীর্তি ছিল এক ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি ছিল প্রথমত চিত্রলিপি এবং পরবর্তীকালে তা শব্দলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এই লিখন পদ্ধতি 'কিউনিফর্ম' নামে পরিচিত। এই লিপি কীলক আকারের ছিল বলে তা 'কীলক লিপি' বা Cuniform নামে পরিচিত। লিপিকরের পাশে থাকত এঁটেল মাটির তাল। সেই তাল থেকে ছোটো ছোটো স্লেট বা মাটির ফলক তৈরি করা হত লেখার জন্য। কাদা মাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাঙ্কনের দ্বারা সুমেরীয়রা মনের ভাব প্রকাশ করত। ছোটো ছোটো খোঁচা রেখার সমন্বয়ে তারা লিখত। খোঁচা খোঁচা আঁচড়গুলি ছিল সাংকেতিক অর্থাৎ এক-একটি আঁচড় এক-একটি মনের ভাবকে বিশেষ বস্তু বা সংখ্যা দ্বারা তারা নির্দেশ করত। আঁচড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ছবিও আঁকা হত। এরপর ইট বা ফলকগুলোকে রোদে পুড়িয়ে শক্ত করা হত। সুমেরীয় লিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হত। সুমেরীয়রা এই লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও তা সারা পশ্চিম এশিয়াতে প্রচলিত ছিল। কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার করেন স্যার হেনরি ক্রেসউইফ রলিনসন। পশ্চিম ইরানের কারমানশাহ হামাদানের বেহিস্তান পাহাড়ের গায়ে প্রায় ৩০০ ফুট ওপরে ২ ফুট লম্বা আর ৫০ ফুট চওড়া এক বিশাল শিলালেখতে কিউনিফর্ম লিপি উৎকীর্ণ দেখে তিনি আশ্চর্য হন। তিনি ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করে নানা পুরাণকথা, অনুশাসন ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে জানতে পারেন।

৬. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:** সুমেরীয় বিজ্ঞানের যেটুকু উন্নয়ন ঘটেছে তা ধর্মকে কেন্দ্র করেই। ধর্মীয় উৎসবের সময় নিরূপণ করতে গিয়ে সুমেরীয়গণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটায়। তারা চন্দ্রের আবর্তনকাল নির্ণয় করতে পেরেছিল এবং চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। অর্থাৎ বছরকে মাস এবং মাসকে দিনে বিভক্ত করেছিল। সুমেরীয়রা গণিতের ব্যবহার জানত। তারা সংখ্যা গণনা এবং অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তাদের গণনাপদ্ধতি, মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি ছিল ষাটের একক ভিত্তিক। তারা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল নির্ণয় ও ঘণমূল নির্ণয় করতে পারত। তারা জলঘড়ির আবিষ্কার করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। টোটকা, জাদু প্রভৃতিতে বিশ্বাসী হলেও ভেষজশাস্ত্রে তারা ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। হস্তলিপিবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যাতে তারা পারদর্শী ছিল।

সুমেরীয়রা ছিল প্রকৃত অর্থে উদ্ভাবক। কৃষিক্ষেত্রে তাঁরা কাঠের লাঙলের পরিবর্তে ধাতুর ফলক সংবলিত লাঙল ব্যবহার করে। Traction Plough বা টানা লাঙলের ব্যবহার জানত তারা। অর্থাৎ গরু বা মহিষ দ্বারা তারা জমি কর্ষণের কৌশল জানত। সুমেরীয়রা উন্নত সেচপ্রযুক্তির ব্যবহার জানত। খাল কেটে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা তাদের উদ্ভাবনী কৌশলের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তারা চাকার সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরি শুরু করে। ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতি, হাতুড়ি, বাটালির ব্যবহার তারা শুরু করে। সুমের পশু টানা চাকাযুক্ত গাড়ির প্রচলন ছিল। জলযান হিসাবে সুমেরীয়গণ 'রীড' নামক জলাভূমিতে উৎপাদিত এক ধরনের নলখাগড়া বেঁধে নৌকা তৈরি করত। এটা ছিল এক ধরনের ডিঙি নৌকা।

আক্কাদীয় সভ্যতা: সুমেরীয় সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতির কালে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-৩০০০ অব্দের মধ্যে আরবের মরু এলাকা থেকে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে

একদল সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর যাযাবর মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে। এই সেমেটিক যাযাবর গোষ্ঠী তাদের যাযাবর বৃত্তি বাদ দিয়ে কৃষিকাজ আয়ত্ত করে উত্তর ব্যাবিলনিয়া বা আক্কাদে বসতি স্থাপন করে। অভিবাসিত নগর আক্কাদ-এর নামানুসারে তাদের আক্কাদীয় বলা হয়। সুমারের উত্তর-পশ্চিম টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তীস্থান সবচেয়ে অপ্রশস্ত অঞ্চলে আক্কাদ অবস্থিত ছিল। আক্কাদীয়রা ছিল মেসোপটেমীয় এলাকায় প্রাচীনতমন সেমেটিক মানুষ। এরা কৃষিকাজে সাফল্য অর্জন করে এবং এক সময় নগরসভ্যতা গড়ে তোলে। এরা বহুকাল ধরেই সুমের অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সুমেরীয়দের উন্নত অস্ত্র থাকায় আক্কাদীয়রা তাদের সাথে পেরে উঠেনি।

আক্রমণকারী সেমেটিয় যাযাবররা সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম মরুভূমি থেকে ইউফ্রেটিসের দিকে অগ্রসর হয় এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপস্থিত হয়। প্রথমে তারা ওপিস নগর দখল করে। সুমেরীয়রা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিত এবং কৌশল ও শৃঙ্খলা শিখেছিল। কিন্তু সেমেটিয় যাযাবররা এগুলির ধার ধারত না। তিরন্দাজ হিসাবে তাদের দক্ষতার উপর সুমেরীয়দের শক্তিশালী ফ্যালানেক্স (Phalanx) বা পদাতিক বাহিনীর ঘন বিন্যস্তব্যূহ-র সাথে তারা পেরে উঠত না। সুতরাং সিনার সমভূমিতে দুই জনগোষ্ঠী একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, উত্তর-পশ্চিমে আধা-অভিবাসিত আক্কাদের সেমেটিয় যাযাবর এবং দক্ষিণে অভিবাসিত কৃষিজীবী সুমেরীয়গণ।

রাজা সারগন (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৭০-খ্রিস্টপূর্ব ২৩১৫): ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় সুমেরীয় রাজবংশের শেষার্ধে নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলে সেমেটিক বংশের আক্কাদীয় নেতা প্রথম সারগন সমগ্র সুমার অধিকার করেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। স্থায়ীভাবে দখলের উদ্দেশ্যে সারগন সুমের আক্রমণ করে বর্শাধারী সুমেরীয় সৈন্যদেরকে তাড়িয়ে এবং সমগ্র সিনার সমভূমিতে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হন। সুমেরীয় নগর রাজাদেরকে তিনি পরাস্ত করেন এবং দুই নদীর মোহনা পর্যন্ত সকল সুমেরীয় শহরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। তিনি আক্কাদীয়দের সুসংবদ্ধ করে কিস শহরের অদূরে আগাছে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

সারগনের পরিচিতি নিয়ে অনেক লোককাহিনি আছে। কোনো বৈধ পিতা না থাকায় কুমারী মা তাঁর জন্মের পর তাঁকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেন। শেষে একজন দাসী তাঁকে কুড়িয়ে এনে লালনপালন করে। বড়ো হলে তিনি কিশ-এর রাজার অধীনে নীচু মানের চাকরিতে যোগ দেন। সৈনিক হিসাবে কাজ করে তিনি

অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরে তাঁর আশ্রয়াদাতাকে অপসারণ করেন ও লুগাল হিসাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষের কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।

সারগন ছিলেন একজন সাম্রাজ্য নির্মাতা। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম সাম্রাজ্য। তিনি রাজা হয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতি জোরদার ও প্রতিরক্ষার উন্নতিতে অবদান রাখেন। সুমের তাঁর ক্ষমতা নিরাপদ করার জন্য পর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর জন্মভূমি কিশ দখল করেন। কিশের রাজা হওয়ার পর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পরিচালিত করেন। তিনি পারস্যের এলাম অধিকার করেন। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে তিনি তাঁর নিজের অধীনে নিয়ে আসনে। তিনি পূর্ব-এশিয়া পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ করেন। সারগন ছিলেন ইতিহাসের প্রথম সেমেটীয় সমরনায়ক এবং পশ্চিম এশিয়ায় একটি শক্তিশালী জাতির প্রথম স্থপতি। তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এলাম। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং পূর্ব এশিয়া মাইনর। তিনি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে সাইপ্রাস অধিকার করেন।

সারগনের সাইপ্রাস অধিকারের পর আক্কাদের সাথে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের পথ খুলে যায়। ফলে সারগনের আমলে আক্কাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকতা লাভ করে। বণিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এশিয়া মাইনর এলাকায় তিনি সেনাদল পাঠান। লাগাশ, উর প্রভৃতি শহরে তাঁর বাণিজ্যিক আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। ক্রীট গ্রীস উপকূল, পারস্য উপসাগরীয় এলাকা ও ইরান পর্যন্ত সারগনের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।

সারগনের প্রচেষ্টায় গোটা পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল আক্কাদ। সারগনের সাম্রাজ্য বিস্তার যাযাবর আক্কাদীয়দের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল। তারা তাদের আগের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে এবং রোদে শুকনো ইঁট দিয়ে বাসগৃহ নির্মাণ করে। প্রথম দিকে তারা লিখতে না পারলেও পরে তারা সুমেরীয়দের সুমেরীয় লিখন কৌশল কিউনির্ফম-এর চিহ্ন ব্যবহার করে সেমেটীয় ভাষায় লিখতে শুরু করে। সুমেরীয়দের নিকট থেকে আক্কাদীয়রা বহু কিছু শিখেছিল। সেমেটীয় আক্কাদীয়গণ সুমেরীয় পঞ্জিকা, দাঁড়িপাল্লা, সংখ্যাপদ্ধতি ও ব্যবসার প্রণালী গ্রহণ করে। তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করে। তারা চামড়া ও তামার হেলমেট তৈরি করেছিল।

সারগনই ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যিনি গ্রাম এলাকায় চাষিদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে একটি নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠনে সফল হয়েছিলেন। এছাড়াও লুগান থাকাকালে সারগন মন্দিরের সম্পত্তি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং সমাজে নতুন শ্রেণী হিসাবে বণিকদের বিকাশের সুযোগ করে দেন। সুমের

বিজয়ের ফলে সেখানকার কিউনিফর্ম লিখনপদ্ধতি, বাণিজ্য কৌশল, পঞ্জিকার ব্যবহার ও নগর নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করে আক্কাদীয়রা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সারগনের মৃত্যুর পর জনগণ তাঁকে দেবতার মতো মান্য করত।

রাজা নারয়ামসিন (খ্রিস্টপূর্ব ২৩২০-খ্রিস্টপূর্ব ২২৮৫): সারগনের পর আক্কাদীয়দের সেরা রাজা ছিলেন নারামসিন। নারামসিন ছিলেন পরক্রমশালী রাজা। তিনি আর্মেনিয়া থেকে পারস্য উপসাগর ও লোহিতসাগর এবং এলাকা পার্বত্যাঞ্চল থেকে ভূমধ্যসগারীয় অঞ্চলের জাগ্রোস পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রীট দ্বীপ ছাড়া সারগনের পুরো সাম্রাজ্যের উপর তাঁর অধিকার ছিল। তিনি 'আক্কাদ-এর ঈশ্বর'—এই উপাধি ধারণ করেন। তাঁর পরাক্রমশীলতার ব্যাখ্যাসহকারে একটি প্রস্তরফলক এলামের রাজধানী সুসাতে পাওয়া গেছে।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নারামসিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। এলামের সাথে তিনি যে সন্ধিটি করেছিলেন তা এলামীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এটিকে পৃথীর প্রাচীনতম সন্ধিচুক্তি বলে মনে করা হয়। নারামসিন বহু মন্দির করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে সুমেরীয়দের অব্যাহত বিদ্রোহ ও বিশাল আক্কাদীয় সাম্রাজ্যে মহা গোলমাল দেখা দিলে বর্বর গুর্তি জাতি আক্রমণ চালিয়ে আক্কাদীয় সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

আক্কাদীয় সংস্কৃতির বিকাশ: আক্কাদীয় শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না। এযুগের শিল্পকলার নিদর্শন খুব কম আবিস্কৃত হয়েছে। তবে একটা বিষয় যে, আক্কাদীয় শিল্পীরীতি যে সুরেমীয় শিল্পকলার প্রভাবে উদ্ভুত তা নিশ্চিত করে বলা যায়। আক্কাদীয় শিল্পকর্মের দুটি নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রথম শিল্পকর্মটি হল নিনিভা থেকে প্রাপ্ত একজন আক্কাদীয় রাজার প্রমাণ সাইজ (Life size) ব্রোঞ্জের মাথা এবং রাজা নারামসিনের বিজয় উৎসব পালনের স্মৃতিফলক স্বরূপ একটি পাথরের স্তম্ভ। আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সারগনের হুবহু প্রতিকৃতি সংবলিত ব্রোঞ্জের মুখমণ্ডল পূর্ববর্তী সুমেরীয় ধাতুর তৈরি মুখ বা মুকুটের তুলনায় ছিল উন্নতমানের। ধাতুর উপাদানও ছিল খুবই উজ্জ্বল। এই শিল্পকর্মের মুখমণ্ডলটির মডেল দেকে আক্কাদীয় পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়—যেমন কুণ্ডলাকৃতি দুভাগে পরিপাটি করা প্রশস্ত কপাল, সুউচ্চ গালের গঠন, দীর্ঘ নাসিকা, কোটরাগত চোখ এবং পুরু ঠোঁট। মস্তকাবরণটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল, কারণ মাথায় একটি ব্যান্ড পরিহিত অবস্থায় মডেলটি দেখা যায়।

নারামসিনের রিলিফ (Relief) যা ছিল (সমতল ভূমি থেকে উঁচুতে নির্মিত মূর্তি) প্রাচীন পৃথিবীর একটি উৎকৃষ্ট মূর্তি এবং সেমেটিয় জাতি কর্তৃক তৈরি প্রথম ভাস্কর্য কর্ম। এটি আক্কাদীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খোদিত স্তম্ভ। High relief-এর মাধ্যমে একটি সমরাভিযান দেখানো হয়েছে। রাজা তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুউচ্চ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় অতিক্রম করে তার পরম শত্রু, পশ্চিম ইরানের লুলুবীর সামন্ত রাজাকে পরাস্ত করেছেন। নিম্নাংশে তির-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নারামসিনের সৈন্য বাহিনী বীরদর্পে অভিযান করছে। রিলিফটিতে তীর্যক প্রতিকৃতি গুলি হাঁটুর ভাঁজ। অস্ত্রশস্ত্রের চালনা গতিময়তার সৃষ্টি করেছে। ত্রিকোনাকার পাথর খণ্ডটির শীর্ষে সূর্য খোদিত রয়েছে। রিলিফটির ভাস্কর এই শিল্পকর্মে সৃজনশীলতা, শৈল্পিক স্বাধীনতা, গতিময়তা, পটপ্রেক্ষিত ও বাস্তবরীতির প্রয়োগ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষাঁড়ের সিং সংবলিত শিরস্ত্রাণ পরিহিত রাজার প্রতিকৃতি তার সৈন্যদের তুলনায় অনেক বড়ো। তিনি বিশালাকার তির ও ধনুক হাতে সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নে চলমান পদাতিক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সুমেরীয় সীল তৈরির শিল্প আক্কাদীয়রা উৎকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছ দেয়। আক্রমণরত অবস্থায় মানুষ ও পশুর মূর্তি তৈরিতে সেমেটিকিয় ভাস্করদের নৈপুণ্যে ভাস্কর্যশিল্পকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়।

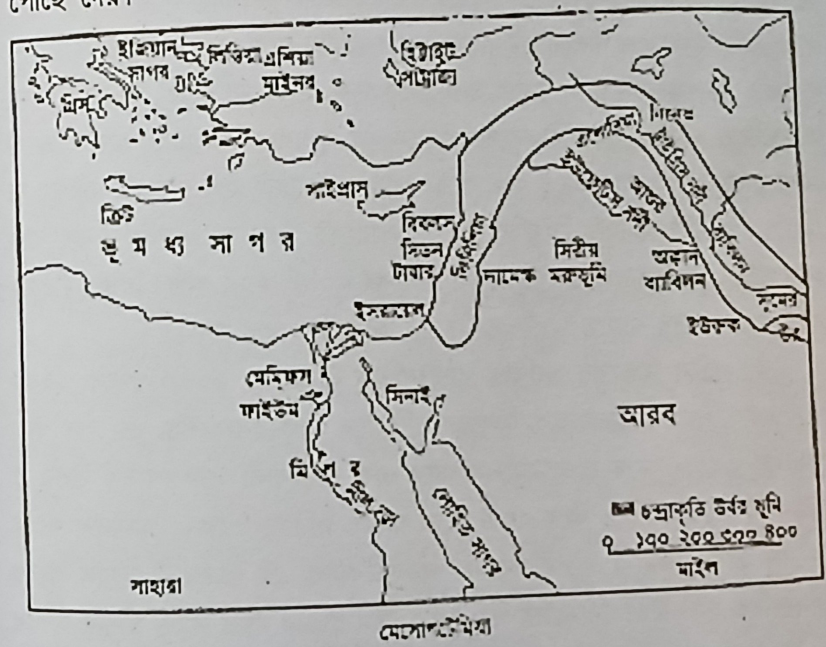

সুমেরীয় ও আক্কাদীয়রা শত্রুর বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করত। সুমেরীয় অস্ত্র ছিল ঢাল ও বর্শা; অপরদিকে আক্কাদীয়দের ছিল তিরধনুক। দুই শতাব্দী পরে আক্কাদের সেমাইটরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সারগনের বংশধরদের পতন হয়। গুতি নামে এক বর্বর জাতি আক্কাদীয়দের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করে। সুমেরীয় সার্বভৌমত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য লাগাসের গুদিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘ সংঘবদ্ধ হয়। ২১০০

খ্রিস্টপূর্বাব্দে উর-এর নেতৃত্বে সুমার পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে বিশেষ অবদান রাখেন ভুঙ্গি নামে এক প্রভাবশাল রাজা। তিনি নিজেকে 'সুমের ও আক্কাদের শাসক' হিসাবে অভিহিত করেন। সুমের ও আক্কাদের যুগ আরম্ভ হয় ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এযুগের প্রথম এক শতাব্দী সমৃদ্ধির কাল ও দ্বিতীয় দুই শতাব্দী ছিল অবনতির সময়পর্ব। ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিরিয়ার অ্যামোরইটগণ সুমার ও আক্কাদ রাজ্য দখল করলে তাদের পতন হয়।

গ. মিশরীয় সভ্যতা (প্রাচীন রাজবংশ পর্যন্ত)

বর্তমান উত্তর আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ মিশর। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির দেশ মিশর। নীলনদের অববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। 'নীলনদের দান' বলে খ্যাত ভৌগোলিক দিক থেকে মিশর দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল এই দুইভাগে বিভক্ত। মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীলনদ ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে। ফলে নীলনদের প্লাবনে মিশরের উত্তরাঞ্চলে পলিমাটি জমে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এসকল কারণে মিশরে নদীমাতৃক নগরসভ্যতা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নীলনদ যদি প্রবল বন্যায় তার উপকূলকে প্লাবিত না করত, তা হলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হত। নীলনদের প্লাবনে যে মূল্যবান পলিমাটি আসত তাতে মিশরে অফুরন্ত ফসল ফলতে শুরু করে। আবার নীলনদই হল একমাত্র নদীপথ যা মিশরকে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দিয়েছিল। এইসব কারণেই মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে ফ্যারাওদের শাসিত মিশর পার্সীয়দের অধিকারে চলে যায়।

A. প্রাচীন মিশরের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস: ৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মিশরের ইতিহাসে প্রাক্-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে রাজা মেনেস নামে এক শক্তিশালী সামন্তশাসক উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে একত্রিত করে একটি বড়ো রাজ্যে পরিণত করেন। মেমফিশ শহরে মেনেস তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই রাজধানী থিব্স শহরে স্থানান্তরিত হয়। রাজা মেনেসের পর থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিশরে ৩১টি রাজবংশের সন্ধান মিলেছে। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, প্রাক্-রাজবংশীয়। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন রাজত্বের যুগ। তৃতীয়ত, মধ্য রাজত্বের যুগ। চতুর্থত, বৈদেশিক হিক্সকদের কালপর্ব এবং নতুন রাজত্বের যুগ। প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দ থেকে। তখন থেকেই মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে 'নারমার' বা মেনেস একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত হন। তিনি প্রথম 'ফ্যারাও'-এর মর্যাদা লাভ করেন। এরপর থেকে ফ্যারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের-পর-এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে।

প্রাচীন রাজবংশ (২৬৮৬-২১৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ): মিশরের প্রাচীন সভ্যতার পুরো সময়কালকে মূলত যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তা পুরাতন রাজত্ব বা প্রাচীন রাজবংশ হল তার মধ্যে প্রাচীনতম। সাধারণভাবে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের শাসনকালকে এই সময়কালের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তৃতীয় রাজবংশের সূচনাকাল থেকে এই সময়কালের শুরু (প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের রাজত্বকালকে বলা হয় আদি রাজত্বের যুগ)। ষষ্ঠ রাজবংশের শেষে ও সপ্তম রাজবংশের শুরুতে প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন যুগের সময়ে এর শেষ। কৃষির প্রয়োজনে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ শাসনকাঠামোর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এর চূড়ান্ত ফল হিসাবেই মিশর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। প্রথম দুই রাজবংশের শাসনের পর ২৭৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত ফ্যারাও জোসার তৃতীয় রাজবংশের সূচনা করেন। তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠা পায় প্রাচীন রাজবংশ। জোসারের নেতৃত্বে একটি শক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরে প্রথম পিরামিড জোসারই নির্মাণ করেন। অবাধ ক্ষমতার অধিকারী প্রাচীন রাজবংশের ফ্যারাওরা মিশরকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। এই পর্বেই প্রধান পিরামিডসমূহ নির্মিত হয়। এ কারণে প্রাচীন রাজবংশের যুগ 'পিরামিডের যুগ' নামেও পরিচিত । প্রথম দুটি রাজবংশের রাজধানী ছিল উচ্চ মিশরের থিনিস-এ। তৃতীয় রাজবংশের আমলে রাজধানী মেনফিসে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম ছয়টি রাজবংশকে মিশরের ইতিহাসে বলা হয় প্রাচীন রাজবংশীয় যুগ। ফ্যারাও ছিলেন দেশের সর্বময় কর্তা এবং দেশের সকল ভূমি এবং সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। নানান কারণে ফ্যারাওদের অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং একটি বড়ো কেন্দ্রীয় প্রশাসন চালাবার ক্ষমতা তাদের লোপ পায়। ফ্যারাওদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় প্রশাসকরা ফ্যারাওদের প্রাধান্য অস্বীকার করতে থাকে। এর সাথে খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ থেকে ২১৫০ অব্দ পর্যন্ত তীব্র খরার কারণে মিশরের প্রাচীন রাজবংশের অবসান হয় এবং মিশর ১৪০ বছরের দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধবিগ্রহে পতিত হয়, যাকে বলা হয় প্রথম অন্তর্বর্তী যুগ।

B. অর্থনীতি: মিশরীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি, কারিগরি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। সংক্ষেপে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি আলোচনা করা হল।

১. কৃষি: প্রাচীন মিশর প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। নীলনদের উর্বর অববাহিকায় কৃষি উৎপাদন ছিল সর্বাধিক। মিশরীয়গণ জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষি ব্যবস্থাকে তাদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছিল। কৃষির উপর নির্ভর করেই মিশরের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। মিশরের উর্বর জমিতে পর্যাপ্ত ফসল জন্মাত। মিশরে প্রাপ্ত দেওয়ালচিত্রে লাঙলের সাহায্যে ষাঁড় দিয়ে জমি কর্ষণ, মই দিয়ে জমির মাটি সমান করা, বীজ বপন, শস্য কর্তন, পশু দিয়ে মাড়াই, শস্যাগারে শস্য মজুত করা এবং কর্মচারীবৃন্দের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ সবকিছুই নিখুঁত ভাবে দেওয়াল চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। মিশরীয়দের উৎপাদিত ফসলের তালিকায় ছিল গম, বার্লি, যব, তুলা, পিচ, পেয়াজ এবং বিভিন্ন শাকসবজি। জমিতে জল সেচের কাজে তারা এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত যা 'শাদুফ' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন মিশরের কৃষিকাজ নীলনদের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা তিনটি ঋতু চিহ্নিত করেছিল। ক) আখেন (বন্যা)। খ) পেরেও (রোপণ ঋতু) এবং গ) শেমু (ফসল কাটার ঋতু)।

বন্যা ঋতুতে নদীর পাড়ে উর্বর পলিমাটি জমত। বন্যার জল সরে যাবার পর ফসল উৎপাদন শুরু হত। এই সময়ে কৃষকেরা জমিতে লাঙল দিত এবং বীজ বপন করত। খালের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া হত। ফসল কাটার ঋতুতে শস্য কেটে মাড়াই করে শস্যদানা আলাদা করা হত। শস্যদানা ঝেড়ে তুষ পৃথক করা হত। তুষমুক্ত শস্যদানা থেকে গুঁড়ো করে ময়দা বানানো হত কিংবা বিয়ার তৈরি করা হত। মিশরের অর্থকরী শস্য ছিল কার্পাস ও একপ্রকার শনজাতীয় তন্তু। এই তন্তু থেকে লিনেন এবং কাপড় তৈরি করা হত। নীলনদের তীরে জন্মানো প্যাপিরাস কাগজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হত। ফল ও সবজির মধ্যে ছিল রসুন, লেটুস, ডাল, তরমুজ, স্কোয়াশ ও আঙুর।

২. পশুপালন ও প্রাণীজ সম্পদ: মিশরীয়দের অপর একটি জীবিকা ছিল পশুপালন। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত জাগতিক শৃঙ্খলার জন্য মানুষ এবং পশুপাখির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা প্রয়োজন। তাই মানুষ পশু ও গাছপালার মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তারা। বন্য এবং পোষা পশু ছিল মিশরীয়দের আধ্যাত্মিকতার উৎস। পশু সম্পদের উপর কর আদায় করা হত এবং যার পশু পালের আকার যত বেশি ছিল তার সামাজিক মর্যাদা ছিল তত বেশি। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছাগল, ভেড়া, গাধা, কুকুর ও শূকর প্রতিপালন করত মিশরীয়রা। হাঁস এবং পায়রা পোষা হত। নীলনদের জলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মৌমাছি চাষ করা হত যা মধু ও মোমের জোগান দিত। মিশরীয়রা গাধা ও ষাঁড়কে ভারবাহী পশু হিসাবে ব্যবহার করত। এদেরকে জমিতে লাঙল দেওয়া এবং জমিতে বীজ বপন করার কাজে ব্যবহার করা হত। হিক্সসরা ঘোড়ার প্রচলন শুরু করে। কুকুর, বানর ও বিড়াল ছিল সাধারণ পোষা প্রাণী। সিংহকে রাখা হত রাজপরিবারের মধ্যে।

৩. কারিগরি শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ: ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয় জনগণের একটি বড়ো অংশ বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের সাথে যুক্ত হয়। ধীরে ধীরে হস্ত ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। মিশরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ ছিল পাথর শিল্প, নৌযান শিল্প, মৃৎপাত্র, কাচ এবং বয়ন শিল্প। নির্মাণ কাজে ব্যবহারে পাথর, অলঙ্কারের পাথর, তামা, সিসা এবং দামি পাথরে মিশর সমৃদ্ধ ছিল। ওয়াদি নাত্রুনের লবণ মমি তৈরিতে ব্যবহৃত হত। সেখানে জিপসামও পাওয়া যেত যা প্লাস্টার করার কাজে ব্যবহার করা হত। সিনাই ও ওয়াদিতে খনিজ সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার ছিল। ঐ খনিজ উত্তোলনে বিশাল অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। নুবিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সোনার খনি। ওয়াদি হাম্পায়ার ছিল গ্রানাইট ও সোনার সুপরিচিত খনিজ পদার্থে। গন্ধক খনি রুপচর্চার কাজে মিশরীয়রাই প্রথম ব্যবহার করেছিল। তামা, মালাকাইট উৎপাদন করত তারা। পাললিক শিলার মধ্য থেকে সোনার খণ্ড সংগ্রহ করা হত। আবার কোয়ার্টজাইট গুঁড়ো করেও তার মধ্য থেকে সোনা বের করা হত। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উচ্চমানের পাথর মিশরে পাওয়া যেত। নীল উপত্যকা থেকে চুনাপাথর, আসওয়ান থেকে গ্রানাইট, পূর্ব মরুভূমির মরুদ্যানগুলো থেকে ব্যাসল্ট ও বেলেপাথর সংগ্রহ করা হত। অলংকারের পাথর যেমন এলাব্যাস্টার, গ্রেওয়াক এবং কারনেলিয়ান পূর্ব মরুভূমিতে প্রচুর পাওয়া যেত। খনি শিল্প, ধাতু শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, মাটির পাত্র, সূতি বস্ত্র, কাচ শিল্প প্রভৃতি মিশরে বিকাশ লাভ করেছিল। পণ্য উৎপাদনের জন্য ক্রমশ কারখানার প্রচলন হয়।

৪. ব্যবসাবাণিজ্য: প্রাচীন মিশরে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উন্নত না হলেও পরে তার প্রসার ঘটে। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় আন্ত ও বহির্বাণিজ্যে মিশরীয়গণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য সামান্য ছিল। মিশর অন্যান্য দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করত এবং সেই সব দিয়ে নানা জিনিসপত্র তৈরি করত। মিশরের সাথে সিরিয়া, ক্রীট, ফিনিশিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। নীলনদের উত্তর-দক্ষিণে বাণিজ্যতরীগুলি সব সময় আসা-যাওয়া করত। নীলনদ থেকে খাল কেটে লোহিত সাগেরর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এতে নৌকা চলাচল করত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও মিশরীয়রা জলপথে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে ফিনিশিয়া, গ্রীস, ক্রীট ও অন্যান্য অঞ্চলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

স্থলপথে ব্যবসায়ীরা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়ায় বাণিজ্যকার্যে ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করত। মিশর সিনাই থেকে তামা, নুবিয়া থেকে সোনা এবং আরব থেকে মশলা আমদানি করত। মিশর থেকে বিদেশে গম, ক্ষৌমবস্ত্র এবং সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্রের রপ্তানি হত। মিশরে সোনা, রুপা, হাতির দাঁত, কাঠ, মশলা, অস্ত্র আমদানি হত। এছাড়া মিশরীয়দের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল সুগন্ধি দ্রব্য, হাতির দাঁত, দেবদারু ও আবলুস কাঠ ইত্যাদি। কার্পাস, নিলেন, শন, রপ্তানি হত বিদেশে। ফ্যারাও এবং অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। মিশরে বিলাসসামগ্রীর খুব অভাব ছিল। তাই বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এইসমস্ত জিনিসপত্রের জোগাড় করতে হত। বিলাসসামগ্রীর মধ্যে ছিল নানান ধরনের সুগন্ধি তেল, মূল্যবান মণিমুক্তো ইত্যাদি। সিরিয়ার সিডার উপত্যকা থেকে আমদানি করা হত ভালো সিডার কাঠ, সাইপ্রাস থেকে আনা হত তামা, দক্ষিণের নুবিয়া থেকে আনা হত সোনা এবং হাতির দাঁত, দামি পাথর, রং আসত দূরের ও কাছের নানান দেশ থেকে। ফিনিশীয়রা বড়ো বড়ো নৌকায় মাল বোঝাই করে মিশরে নিয়ে আসত প্রাচীন কাল থেকেই। ব্যবসার ক্ষেত্রে মিশরীয়রা কিছু ব্যবহারিক পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। অ্যাকাউন্টিং এবং বুক কিপিং সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল। বণিকরা তাদের পণ্যের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করত এবং রশিদ সংগ্রহ করত।

৫. মুদ্রা ও বিনিময়: মুদ্রার উদ্ভাবন না হওয়ায় মিশরীয়রা মুদ্রাঅর্থনীতি গড়ে তুলতে পারেনি। তবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে তামার টুকরো, বিভিন্ন ওজনের স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করত তারা। মিশরীয়দের এই বিনিময়ের মাধ্যম প্রাচীনতম প্রতীক মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে বৃহত্তর বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই এ ধরনের মাধ্যম ব্যবহৃত হত। অভ্যন্তরীণ লেনদেন চলত বিনিময়ের মাধ্যমেই।

C. সামাজিক স্তরবিন্যাস: মিশরীয় সমাজ ছিল বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। নীলনদের তীরে বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ধীরে ধীরে একটি সমাজ সংগঠন গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীগত প্রভেদ ছিল। মিশরীয় সমাজে কয়েকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ক) শাসকগোষ্ঠী সম্রাট, খ) অভিজাত সম্প্রদায়, গ) পুরোহিতবর্গ, ঘ) মধ্যবিত্ত লেখক, বণিক, স্থপতি, কারিগর, শিল্পী এবং ঙ) কৃষক ও ভূমিদাস। সাম্রাজ্যের যুগে আরেকটি শ্রেণী হিসাবে সৈন্যদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

১. শাসকগোষ্ঠী সম্রাট: মিশরের রাজাকে 'ফ্যারাও' বলা হত। 'পেরো' শব্দ থেকে 'ফ্যারাও' শব্দের উৎপতি হয়। 'পেরো' শব্দের অর্থ হল 'যে মানুষ বড়ো বাড়িতে বাস করেন।' বিভিন্ন বংশের ফ্যারাওগণ প্রায় তিন হাজার বছর রাজত্ব করেন। রাজা বা ফ্যারাওকে ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী ও ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে মনে করা হত। ফ্যারাও ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ শাসক, সর্বোচ্চ বিচারক ও আইন প্রণেতা। আইনত তিনি ছিলেন কৃষিজমির একমাত্র মালিক। তবে তিনি কৃষিজমির কিছু অংশ রাষ্ট্রের মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ফ্যারাওদের দৈনন্দিন জীবন ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। তিনি যখন রাজপ্রাসাদের বাইরে যেতেন তখন অভিজাতবংশীয় ও ধনী ব্যক্তিগণ তাঁর সহচর হতেন। তাঁকে মূল্যবান জিনিসপত্র ও মণিমুক্তো উপহার দিতেন। একদল দেহরক্ষী, পোশাক প্রস্তুতকারক, নানা সুগন্ধময় আতর প্রস্তুতকারক ও বহু ভৃত্য সর্বদাই তাঁর ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত থাকত, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ফ্যারাও ছিলেন সর্বময় কর্তা।

I. অভিজাত সম্প্রদায়: মিশরীয় সমাজে সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর। অভিজাতশ্রেণী শাসনকার্য পরিচালনা করত। অভিজাতরা সর্বাধিক সামাজিক মর্যাদা ও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। অভিজাতশ্রেণীর সদস্যরা বিলাসপ্রিয় ছিল। তারা ফলাহার ও পানীয় সেবন করত।

II. পুরোহিতবর্গ: প্রাচীন রাজবংশে ফ্যারাও ছাড়াও পুরোহিতরা সমাজের উচ্চস্থানে বাস করত। মিশরীয়রা ফ্যরাওকে দেবতা মনে করতেন। ফ্যারাওদের প্রতি জনগণের আনুগত্যের দাবি করতেন পুরোহিতরা। ফ্যারাওরা পুরোহিত নিয়োগ করতেন এবং তাঁরাই ফ্যারাও-এর ধন, মান, প্রাণ ও সমৃদ্ধির জন্য দেবতার পূজা করত। মিশরবাসীর যাবতীয় ধ্যান-ধারণার অভিভাবক ছিলেন এই পুরোহিতরা। এই কারণে সমাজে পুরোহিতদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। মিশরীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে ফ্যারাও বা রাজার পরেই স্থান ছিল পুরোহিতদের। দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য মিশরীয়রা পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছুই উৎসর্গ করত। চাষিরা শস্য ও শাক-সবজি মন্দিরে নিয়ে আসত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উৎসর্গ করত সোনা-রুপা, দাস-দাসী ও পশু। আর ফ্যারাওরা উৎসর্গ করত উর্বর শস্যক্ষেত্র। এর ফলে মন্দির ও পুরোহিতরা বহু সম্পদের মালিক হয়ে যায়। মন্দিরের ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ায় পুরোহিতরা দাস-দাসী, জমি-জমা ও সোনা-দানার অধিকারী হয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। অনেক সময় পুরোহিতরা ছিল ফ্যারাও-এর খাজাঞ্চী কখনও মন্ত্রী, কখনও সেনাপতি।

III. মধ্যবিত্তশ্রেণী: প্রাচীন মিশরে লিপিকর, তহশিলদার, বণিক, স্থপতি, কারিগর ও শিল্পীরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। লেখক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা একযোগে অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে সরকারি কাঠামোয় এ সকল শ্রেণীর মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার মালিকরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

লেখক বা লিপিকর ছিল মিশরীয় আমলাতন্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ। লিপিকরকে নানান ধরনের কাজ করতে হত—যেমন লোক গণনা করা, আয়করের হিসাব রাখা, নদীর জলের গতির উপর লক্ষ রাখা, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর তদারকি করা, গবাদী পশুর হিসাব রাখা ইত্যাদি। রাষ্ট্রে খাজনা আদায়ের জন্য 'নামার্ক' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। এরা ছিল তহশিলদার বা খাজনা আদায়কারী। তারা নিজ নিজ এলাকায় খাজনা আদায় করত।

IV. সৈনিক: ফ্যারাওদের দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী হিসাবে একদল সৈন্য সর্বদাই সুসজ্জিত থাকত। প্রাচীন মিশর যুদ্ধপ্রিয় ছিল না। ফ্যারাওদের সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গ ছিল পদাতিক বাহিনী। চাষিদের নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হত। যুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা ছাড়াও প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড প্রভৃতির নির্মাণ কাজে সেনা ও শ্রমিকবাহিনী নিযুক্ত করা হত। দাস মালিকদেরও সেনা থাকত।

V. কৃষক ও ভূমিদাস: সমাজের সর্বনিম্নস্তরে ছিল শ্রমিক, কৃষক ও ভূমিদাসরা। চাষিদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা প্রভুদের জমি চাষ-আবাদ করত, বিনিময়ে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন পেত। তাছাড়া কিছুসংখ্যক মুক্ত চাষিও ছিল। তারা নিজেদের জমি চাষ করা ছাড়াও জমিদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের চাষ ও সেচের কাজে নিযুক্ত থাকত। মজুরদের একটি অংশ ছিল মুক্ত, অপর অংশ ছিল ক্রীতদাস। মুক্ত মজুররা কাজের জন্য মজুরি পেত। ক্রীতদাসদের কোনো ব্যক্তিগত সত্তা ছিল না। অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবন্দি ও দণ্ডিত অপরাধী। অমানুষিক অত্যাচার ও কঠোর পরিশ্রমই ছিল তাদের জীবনযাত্রা। অনাহারে মৃত্যু ছিল তাদের পরিণতি। পিরামিড, মন্দির, সুউচ্চ অট্টালিকা ও সৌধ নির্মাণের এই সমস্ত শ্রমিককে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করতে হত। ভূমিদাসগণ ও শ্রমিকশ্রেণী সমাজের ও পরিবারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করত—যেমন কৃষিকাজ, পশু দ্বারা শস্য মাড়াই, গাভী দোহানো, মৎস্য শিকার, কসাই-এর কাজ। হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, মন্দিরের দেবতার জন্য অর্ঘ্য প্রস্তুত, বলিদানের জন্য মন্দিরে ষাঁড় আনয়ন, মদ তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্রাক্ষা আহরণ ও মাড়াই ইত্যাদি।

D. রাষ্ট্রকাঠামো: প্রাচীন রাজবংশের রাষ্ট্রকাঠামো ছিল একনায়কতান্ত্রিক। তবে একনায়কতান্ত্রিকের থেকে 'পুরোহিততন্ত্র' বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। ফ্যারাওগণ এক ধরনের ঐশীতন্ত্রে (theocracy) বিশ্বাসী ছিলেন। যদি তিনি একনায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই থাকেন, তা হলে তা ছিল দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপেই তিনি দেশে শাসন করতেন। রাজা নিজেকে মনে করতেন তিনি ছিলেন সূর্যদেবতা *'রে'*-এর পুত্র। প্রাচীন রাজবংশের যুগে ধর্মমন্দির ও রাষ্ট্রের মধ্যে

অভিন্নতা ছিল। মন্দিরের প্রধান ছিলেন পুরোহিত। যেহেতু রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং ঐশ্বরিক মানমর্যাদার অধিকারী, সেহেতু তার পরিবারের বাইরে অন্য কারোর সাথে বিবাহ হত না। রাজার ক্ষমতার উৎস ছিল ঐশ্বরিক এবং এই ক্ষমতা দেশের বিচারব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হত।

১. পুরোহিত রাজা: প্রাচীন মিশরীয় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং ধর্ম পৃথক ছিল না। পুরাতন রাজবংশের আমলে রাজা ছিলেন প্রধান ধর্মগুরু বা পুরোহিত। ফ্যারাওদের অধীনে বিভিন্ন মন্দিরে পুরোহিতগণ ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। আবার কখনো-কখনো ফ্যারাও নিজেও প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতেন। প্রশাসনিক কার্যকলাপের জন্য তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী বা 'ভিজিয়ার', স্থপতি, পূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী, প্রধান বিচারক এবং অসংখ্য বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তা নিয়োগ করতেন। ফ্যারাওদের নির্দেশে কর্মচারীবৃন্দ তাদের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতেন। প্রাক্-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতকগুলো ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলিকে 'নোম' বলা হত। রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে এসময় ফ্যারাও কর্তৃক গভর্নর নিয়োজিত হত। ফ্যারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। ভবিষ্যৎ ফ্যারাও হিসাবে নির্বাচিত কোনো ফ্যারাওপুত্র পিতার অধীনে প্রধানমন্ত্রী বা পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। যখন তিনি ক্ষমতায় আসতেন তখন একজন শিক্ষিত ও যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বিভিন্ন নাগরিক কার্যাবলী, খনি, নির্মাণ, শিল্প, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির তদারকি করতে পারতেন। ফ্যারাওরা জনকল্যাণমুখী কার্যাবলী গ্রহণ করতেন।

২. বিচারব্যবস্থা: প্রাচীন রাজবংশের আমলে বিচারব্যবস্থা ছিল খুবই সুষ্ঠু এবং উচ্চমানের। প্রাচীন রাজবংশের যুগে বিধিবদ্ধ কোনো আইনের কাঠামো না থাকলেও একটি বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আইনবিশারদ ও বিচারপতি না থাকলেও প্রশাসকবর্গ বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সর্বমোট ছয়টি আদালতে এইসকল প্রশাসকগণ বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। অনেক সময় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। আপিলের ব্যবস্থা ছিল এবং ফ্যারাও আপিলের সর্বোচ্চ আদালত ছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিচার করে নিষ্পত্তি করা হত। প্রাচীন রাজবংশের আমলে সাধারণ অপরাধ এবং রাজনৈতিক অপরাধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না।

৩. সামরিক সংগঠন: প্রাচীন রাজবংশের সরকার আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেনি। এই শান্তিবাদী নীতি প্রাচীন রাষ্ট্রকাঠামোতে ছিল অভিনব। পুরাতন রাজবংশের আমলে নিয়মিত সামরিক বাহিনী ছিল না। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হয়নি। প্রতিটি

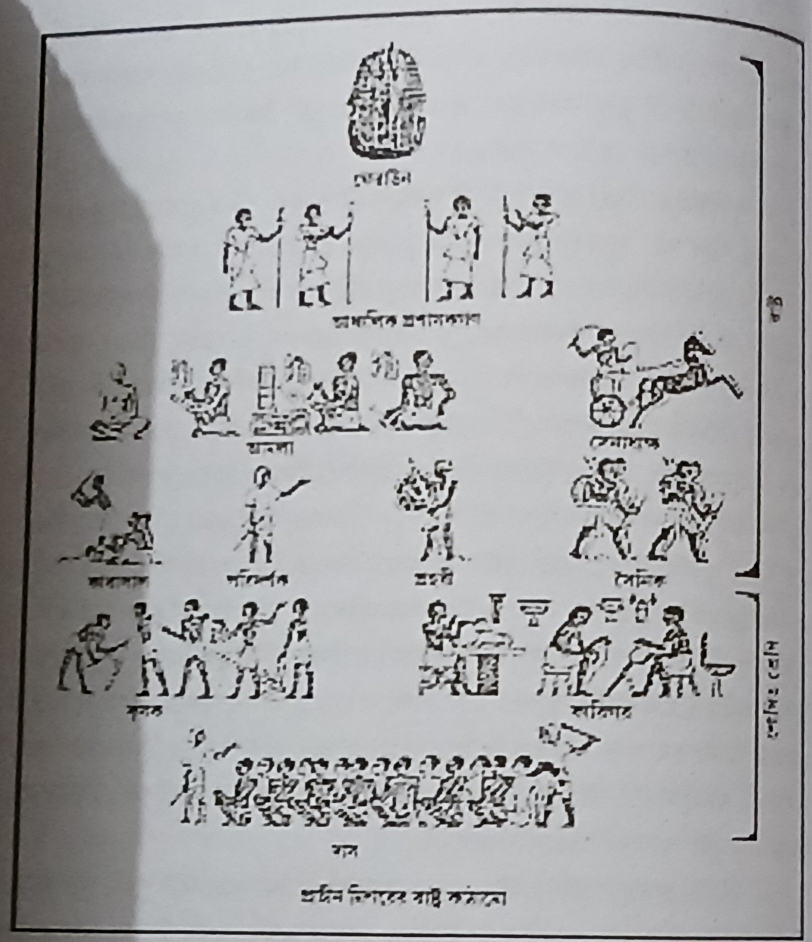

'নোমে' স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখত। বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই সকল *মিলিশিয়া* একত্রিত হয়ে ফ্যারাওদের নেতৃত্বে সমরাভিযান করত। দেশজয়, সমরাভিযান ও স্বৈরতন্ত্রের বিকাশের প্রতি ফ্যারাওগণ আকৃষ্ট ছিল না। সামরিক সদস্যরা জনকল্যাণমুখী কাজেই বেশি অংশ নিত। শুধু বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে ফ্যারাও-এর নির্দেশে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হত।

E. ধর্ম: প্রাচীন মিশরীয় সমাজে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। রাজা বা ফ্যারাও ছিলেন প্রধান ধর্মীয় নেতা। মিশরীয়দের জীবন ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। তাদের প্রধান

দেবতার নাম ছিল *'রে'*—যিনি ছিলেন সূর্যদেবতা। প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা ছিলেন *'ওসিরিস'*। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত ফ্যারাও যেমন লোকেদের পরিচালনা করেন, তেমনি *'রা'* দেব-দেবীদের পরিচালনা করেন। মিশরবাসী সূর্যকে বিশ্বের স্রষ্টা জ্ঞানে উপাসনা করত। *'ওসিরিস'* ছিলেন কৃষির রক্ষাকর্তা। *'আমন'* ছিলেন প্রাচীন মিশরীয়দের বাস্তুদেবতা এবং যুদ্ধদেবতা। দেবতারা পশুপাখি বা বৃক্ষরূপে পৃথিবীতে এসেছেন—এই বিশ্বাসে মিশরবাসীরা কোনো দেবতাকে কল্পনা করেছে বিড়াল রূপে, কুমারী রূপে, ভেড়া রূপে। উদ্ভিদের মধ্যে খেজুর গাছকেও তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করত।

মমি: মিশরবাসী পরলোকে বিশ্বাসী ছিল। তারা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরেও মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে। তাদের ধারণা ছিল দেহ ছাড়া আত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হবে। যতদিন পর্যন্ত মৃতদেহকে রক্ষা করা যায় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় রাখা যায়, ততদিন পর্যন্ত মৃতের আত্মা বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং মৃত্যুর পর মৃতদেহকে রক্ষা করার কৌশল তারা আবিষ্কার করেছিল। মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি একদিন ঠিক বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। নুনের জল ও একপ্রকার মশলা দিয়ে দেহটিকে সিক্ত করা হত। পরে ঔষধমিশ্রিত কাপড়ে জড়িয়ে কবরে রাখা হত। এভাবে রক্ষিত দেহকে বলা হত 'মমি'। মমির সাথে মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্যবস্তু, পানীয় ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা হত। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল।

F. সংস্কৃতি: মিশরীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় যেমন—লিখনকৌশল, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. লিখনকৌশল ও কাগজের আবিষ্কার: মিশরীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগরসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনকৌশলের উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন মিশরীয়দের নিজস্ব লিপি ছিল। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় *'হায়ারোগ্লিফিক'* বা পবিত্র অক্ষর। প্রথমে চিত্রের সাহায্যে কোনো একটি বস্তুকে বোঝানো হত। তারপর ধীরে ধীরে এক-একটি চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপি চিহ্ন দিয়ে এই প্রাচীন মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছিল। বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে তারা যে শুধু গোটা শব্দ প্রকাশ করত তাই নয়, সেগুলো আলাদা আলাদা অক্ষর বা শব্দাংশ বোঝাত। লেখার সরঞ্জাম ছিল খুব সাধারণ ও সস্তা। নীলনদের দু'ধারে নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের গাছ প্রচুর

জন্মাত। গ্রিকরা ঐ গাছের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। যে শব্দ থেকে ইংরেজি 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি। মিশরীয়রা নলখাগড়ার ডাঁটাগুলোকে খুব পাতলা ভাবে চেরাই করত। তারপরে এই গাছেরই পাতার উপর আঠা দিয়ে সেঁটে দিত। প্যাপিরাসের পাতা রং-এ চুবিয়ে নিয়ে তার উপর লেখা হত। মিশরীয়রা পাথর খোদাই করেও লিখত। ১৭৯৮ সালে ফরাসি বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর অভিযানের সময় এক ফরাসি সৈনিক রোসেটা নদীর তীরে বালির স্তূপ থেকে একটি পাথরের ফলক আবিষ্কার করেন। এই ফলকটির ওপর তিন প্রকারের লেখা ছিল—হায়ারোগ্লিফিক বা চিত্রাক্ষর, ডেমোনিক ও গ্রিক অক্ষর, যা 'রসেটা স্টোন' নামে খ্যাত। ১৯২৩ সালে ফরাসি পণ্ডিত শাঁপলিয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন।

২. শিল্পকলা: প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান ও মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

৩. পিরামিড: ফ্যারাওগণ নিজেদের সমাধির জন্য যে-সকল মন্দির তৈরি করেছিলেন সেগুলোকে বলা হয় পিরামিড। এগুলোর অধিকাংশই মরুভূমিতে অবস্থিত। পিরামিডগুলো আকারে চতুষ্কোণ—মাটির উপর থেকে আয়তন কমিয়ে শীর্বদেশ পরিণত করা হয়েছে একটি বিন্দুতে। এককথায়, পিরামিড হল পাথরের তৈরি বিশালাকার সমাধি মন্দির। পিরামিডের তলদেশে থাকত ফ্যারাও-এর সমাধি কক্ষ। সমাধিকক্ষে প্রবেশের জন্য গুপ্ত পথ ছিল। পরলোকে ব্যবহারের জন্য ফ্যারাওদের মমির পাশে নানা খাদ্যসামগ্রী, মণি-মুক্তো ও আসবাবপত্র রাখা হত। ফ্যারাও তুতানখামেনের সমাধি থেকে বহু মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনার পালঙ্ক, সোনার শবাধার পাওয়া গেছে। কায়রোর নিকট গাজার নিকটস্থানে মিশরের সবচেয়ে বড়ো পিরামিডটি নির্মাণ করেছিলেন ফ্যারাও খুফু। মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হল 'স্ফিংক্স'। খুফুর পিরামিডের কাছেই সম্পূর্ণ একটি পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছি 'স্ফিংক্স'। 'স্ফিংক্স' এমন একটি মূর্তি, যার দেহটি সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের মতো। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই যুগকে বলা হয় 'পিরামিডের যুগ'। মিশরীয় স্থাপত্যকলার এক চরম নিদর্শন হল পিরামিড।

৪. কারুশিল্প: কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি

মিশরীয় কারুশিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। চাষিরা মাটির সঙ্গে গাছের ডালপালা ও নলখাগড়া মিশিয়ে ঘর তৈরি করত। তারা তৈরি করত মাটির বাসনপত্র।

৫. চিত্রকলা: মিশরের চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। মিশরের চিত্রশিল্পের সূচনা হয় আর মন্দিরের দেওয়াল সাজাতে গিয়ে, তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা ও কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদকানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেওয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন। ঐসকল ছবির মধ্যে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি ফুটে উঠেছিল।

৬. বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যা: মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে-কারণে নীলনদের প্লাবন, নাব্যতা, জলপ্রবাহের মাপ, জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। মিশরীয়রা গণিতশাস্ত্রের দুটি শাখা—জ্যামিতি ও পাটিগণিতের প্রচলন করে। পরিমাপ, ব্যবসার লেনদেন, পিরামিডের আকার ও পাহাড় কাটার মাপে গণিতের ব্যাপক ব্যবহার করেছিল তারা। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌরপঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর গণনার হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়া ঘড়ি ও জল ঘড়ি আবিষ্কার করে।

প্রাচীন মিশরে কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নানাপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। লক্ষাধিক পাথর টুকরো করে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে পিরামিড তৈরি করা হত। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মিশরীয়দের প্রযুক্তি ও কারিগরি কৌশল কত উন্নত ছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারা চোখ, দাঁত ও পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তারা রপ্ত করেছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত। চিকিৎসাশাস্ত্রে মিশরীয়রাই প্রথম 'মেটেরিয়া মেডিকা' বা ঔষধের তালিকা প্রণয়নে সক্ষম হয়। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য এক ধরনের ঔষধ আবিষ্কার করেছিল মিশরীয়রা।

মিশরীয় সভ্যতার পতন: প্রাচীন মিশরের বিংশতম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন একাদশ রামসেস। এসময় মিশরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১০৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে থিবস শহরের প্রধান পুরোহিত বা ধর্মযাজক সিংহাসন দখল করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিশর অধিকার করলে মিশরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে।

অতঃপর ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার মিশর অধিকার করেন। তারপর থেকে মিশরে 'টলেমি রাজবংশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমি রাজবংশ দীর্ঘদিন মিশর শাসন করে। এই বংশেরই রানী ছিলেন ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার সময় মিশর বারংবার রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালক্রমে রোমানরা মিশরে রোমান শাসন বিস্তার করে।

মিশরীয় সভ্যতা